Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস যা বলে

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়শা বিনতে আনোয়ার

রোলঃ ২১৫০০১১৩৮

২৬ নভেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস যা বলে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়শা বিনতে আনোয়ার

রোলঃ ২১৫০০১১৩৮

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস যা বলে" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়শা বিনতে আনোয়ার, আইডিঃ ২১৫০০১১৩৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস যা বলে" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মামুনুর রশীদ- উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Ayeshanowar

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৬ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

আয়শা বিনতে আনোয়ার

আইডিঃ ২১৫০০১১৩৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
লেখিকার কলাম	৫
ভূমিকা	৬
পবিত্র কুরআনের অবতরণ ও লিপিবদ্ধকরণ	৭
কুরআনের সংকলন	১৫
১. সাব'আতু আহরুফ	১৫
২. নবিজী ﷺ -এর যুগে সংরক্ষণ	১৯
৩. খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ	২৩
৪. উসমান (র.) এর যুগ	২৪
জায়েদ (র.) এর গবেষণা পদ্ধতি	২৬
পূর্ণ কুরআনকে সর্বপ্রথম একত্র করার ইতিহাস	২৭
কুরআন সহজকরণ	২৮
তাজউইদ যেভাবে এল	৩৯
তাজউইদ পরিচিতি	৪২
শেষ কথা	৪৭

লেখিকার কলাম

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি এত বড় একটি কাজ আঞ্জাম করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অসংখ্য-অগনিত শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহামহিম রব্বে কারীমের যিনি, "কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস যা বলে" এসাইনমেন্ট এর কাজটি সম্পন্ন করার তাওফিক দিয়েছেন।

সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী। দু'আ করবেন আল্লাহ যেন এই এসাইনমেন্টটি কবুল করেন, সাথে সাথে আমি অধমকেও। এবং এসাইনমেন্টটি যেন আমার নাজাতের ওয়াসিলা হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে বাকি কাজগুলো করতে পারি সেজন্যও দু'আ করবেন।

সবশেষে বলতে চাই, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এসাইনমেন্টের কোন অংশে অসংগতিপূর্ণ কোন কিছু পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে আমাকে অবগত করার চেষ্টা করবেন। পরবর্তীতে তা ঠিক করা হবে ইন শা আল্লাহ।

আয়শা আনোয়ার

ইমেইল: ayeshaakterctg8987@gmail.com

ভূমিকা

আল্লাহ কুরআনকে সহজ করেছেন। তবু যদি আমরা কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জ্ঞান আহরণ করতে ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের অন্তরগুলো সেই ভাঙ্গা ঘরের ন্যায় হয়ে যাবে যেই ভাঙ্গা ঘরের কথা আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন-

إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخَرِب

“যে ব্যাক্তির অন্তরে কুরআনের কিছুই নেই, সেই অন্তর ভাঙ্গা ঘরের মতো।”

(তিরমিযী-২৯১৩)

পবিত্র কুরআনের অবতরণ ও লিপিবদ্ধকরণ

১. প্রেক্ষাপট

সুসজ্জিত মূর্তিগুলো সাজানো হয়েছে কা'বার চত্বরে। আর কা'বার ভেতরে রয়েছে তুলনামূলক হাই ক্যালিভারের মূর্তিগুলো। তাদের সামনে খাদ্য-সামগ্রী রাখা হচ্ছে, স্বর্ণ-গয়না উপঢৌকন হিসেবে পেশ করা হচ্ছে বা মানতের দীনার-দিরহাম প্রদান করা হচ্ছে। হজ্জের মৌসুমে দূর-দূরান্ত থেকে এখানে ভিড় জমায় হাজার হাজার মানুষ। উদ্দেশ্য, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ। নারীদের তাওয়াফের সময় আলাদা। কারণ, তারা বিবস্ত্র হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে। নারীদের কোনো সম্মানই দেয়া হয় না। তারা তাদের ন্যায্য সম্পত্তিটুকু পায় না, আর ইয়াতিম বা বিধবা হয়ে গেলে তো তাদের মাথায় যেন পুরো আকাশ ভেঙে পড়ে আর পা থেকে মাটি সরে যায়। শত্রুপক্ষের কেউ নিজের কন্যাকে বিয়ে করে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে শত্রুপক্ষের কাছে পরোক্ষভাবে হেরে যাওয়া। এ ছাড়া আরও নানানভাবে কন্যাসন্তান তাদের কাছে বেইজ্জতির কারণ। তাই কন্যাসন্তান জন্ম হয়ে গেলে মরুভুমির তপ্ত বালিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলাই তাদের কাছে একমাত্র সমাধান। ব্যভিচারও সহজলভ্য। ব্যাভিচারিণীদের ঘরের ওপরে ওড়ে নির্দিষ্ট প্রতীকী পতাকা। গর্ভে সন্তান এসে পড়লে লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে যে, সন্তানের বাবা কে। মদ-জুয়ার আসরগুলো জনপ্রিয়। কথায় কথায় মারমার কাটকাট আচরণ। কৃতদাসেরা পায় না তাদের অধিকার। যে যেভাবে পারছে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে। এসবের ভিড়ে একটি অন্তর পরিশুদ্ধ, সেই অন্তরে কোনো কালিমা নেই। মুখে তাঁর মাধুর্য, যেন মুক্তো ঝরে। পরিমাণে অল্প, কিন্তু ব্যাপক অর্থবহ তাঁর একেকটি বাক্য। সত্য ব্যতীত একটি মিথ্যা তিনি বলেন না। প্রতিটি মানুষ তাঁর কাছে নিরাপদ, তিনিও প্রত্যেকের কাছে নিরাপদ। তাই তো মাক্কাবাসীরা তাঁকে সদিক, আমীন অর্থাৎ সত্যবাদী, বিশ্বাসভাজন ইত্যাদি নামেই ডাকে। জগতের মানুষ যখন আঁধার কালোয় নিমজ্জিত তখন একটি হৃদয় নূরের তাজাল্লীতে সাফ-সুতরা। আরশের অধিপতিও সেই ক্বলবকেই বাছাই করেছেন তাঁর কালামপাক ধারণের জন্য। তিনি সেই প্রশংসিত ব্যক্তি, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।

২. কুরআন যখন নাযিল হলো

হেরা গুহায় প্রথম অবতরণ হলো লাওহে মাহফুজ থেকে নূরের ছটা। নবী হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ- এর

প্রায় ২৩ বছর সময়কালে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'আলা সুস্পষ্ট বিধিবিধান ও প্রয়োজনীয় ফরমান আয়াত হিসেবে অবতরণ করেছেন। কুরআনের একেকটি আয়াত বা আয়াতসমূহ এভাবে খন্ডাকারে নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই তা রাসূল ﷺনিজে মুখস্থ করে নিয়েছেন এবং বহু সাহাবীও রাসুল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে মুখস্থ করেছেন। এ ছাড়া রাসুল ﷺ- এর জমানায় একাধিক সাহাবী লিপিকার বা কাতিব হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আরক্বাম (র) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺএর পত্রলেখক। তিনি রাসূলুল্লাহ এর সকল পত্রের শ্রুতিলিখন করতেন। এই কারণে। রাসূল ﷺতাঁকে সিরিয়াক ভাষা শিখতে বলেছিলেন। সিরিয়াক হলো এরামিক থেকে উদ্ভূত হওয়া একটি ভাষা। বর্তমানেও এশেরিও ইরাকীরা উক্ত ভাষা ব্যবহার করে। আব্দুল্লাহ ইবনে আরক্বামকে (র) সিরিয়াক ভাষা এই কারণে শিখতে বলা হয়েছিল। যাতে ওই অঞ্চলের মানুষদের সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন সহজ হয়। অতঃপর তিনি মাত্র ১৮ দিনে সিরিয়াক ভাষা রপ্ত করেন। এর পাশাপাশি তিনি ওহীও শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে লিপিবদ্ধকরণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

হাজার আল আসক্কালানী (র) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন, যুবাইর ইবনে আওয়্যাম (র) ও আবু জাহম (র) যাকাতের বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। এ রকমই একাধিক কাতিবে ওয়াহি বা ওয়াহি লিপিবদ্ধকারীগণ গাছের বাকল, কাপড়, হাড়ের টুকরো, পাথর, চামড়ার মতো বিভিন্ন উপকরণে আয়াতগুলো লিখে নিয়েছিলেন।

এসব কিছুই হয়েছে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশানুযায়ী। আর প্রাণের রাসূল ﷺ তাঁর রবের আদেশ ব্যতীত কোনো কার্যই সম্পাদনা করেননি। কাজেই বলা যায়, মুহাম্মাদ ﷺতাঁর পবিত্র জীবদ্দশাতেই তাঁর ওপর নাযিল হওয়া সম্পূর্ণ কুরআন কতিপয় সাহাবীদের মুখস্থ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে এর সংরক্ষণের প্রথম ধাপ সম্পন্ন করেছেন।

এর আগে আমরা জানতে পেরেছি যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অনুসারীরা তাদের কিতাব পরিবর্তন করে ফেলেছিল। আল্লাহ সেগুলোকে সংরক্ষণ করার ইচ্ছা করেননি কারণ এর তেমন প্রয়োজনীয়তা ছিল না, যেহেতু সেসব কিতাব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট কিছু জাতির জন্য নাযিল হয়েছিল। এ ছাড়া এটা ছিল তাদের জন্য পরীক্ষা যে তারা কি তাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করবে নাকি নিজেদের অন্তরের খাহেশাতকে প্রাধান্য দেবে। কিন্তু কুরআন যেহেতু তামাম দুনিয়ার মানুষের জন্য শেষ দিন পর্যন্ত একটি শাশ্বত বিধান তাই এর অপরিবর্তনীয়তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আল্লাহ কুরআনকে সংরক্ষণ করবেন শেষ দিন পর্যন্ত। সাথে তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন যে, আমাদের কিতাব সংরক্ষণে আমাদের প্রচেষ্টা কতটুকু।

আল্লাহর রাসূল ﷺও তাঁর সাহাবীগণ মুখস্থের মাধ্যমে কুরআন অন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তাঁদের জন্য মুখস্থকরণই ছিল কুরআন সংরক্ষণের সর্বোত্তম পন্থা। তবে শুরু থেকেই গাছের বাকল, পাথর ও চামড়ার মতো বিভিন্ন উপকরণে কুরআনের আয়াত লিখে রাখা হতো, যেহেতু সেই সময় আরবে কাগজের প্রচলন ততটা শুরু হয়নি। এদিকে মুখস্থের পাশাপাশি প্রয়োজন ছিল মুখস্থকারীদের জবাবদিহিতার ভয়। আর আল্লাহর রাসূল সাহাবীদের অন্তরে সেই জবাবদিহিতার ভয়ের বীজ বপন করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর অপার্থিব গুণাবলির মাধ্যমে। আমরা এরকম অনেক প্রমাণ পাই যে, দ্বীনের মাঝে যাতে কোনো নতুনত্ব প্রবেশ না করে সেদিকে সাহাবীগণ খুবই রক্ষণশীল ছিলেন। পরবর্তী সময়ে সাহাবীদের তত্ত্বাবধায়নে ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে কুরআন সংরক্ষিত ও সংকলিত হয়েছে, তাশকীল-ই'জাম যুক্ত হয়েছে। পরবর্তী বিজ্ঞ আলিমদের জমানায় বিভিন্ন কিরাআতের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি ও নিয়ম সংরক্ষিত হয়েছে, তাজউইদের নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আল-আদাবুশ শারইয়্যা-২/১৬১

আত-তালখিসুল হাবীর- ৪/৩৪৬, ৩৪৭

যাদুল মা'আদ- **১/১১৭** অনুযায়ী কাতিবে ওয়াহীর সংখ্যা **১৭** জন যারা নিয়মিত ওহী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা হলেন- আবু বকর, উমার, উসমান, আলী, যুবাইর ইবনে আওয়্যাম, আমির ইবনে ফুহাইরাহ, আমর ইবনুল 'আস, উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম, সাবিত ইবনে কায়েস, হানযালা ইবনে রাবি', মুগীরা ইবনে শু'বাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ, খলিদ ইবনু ওয়ালিদ, খালিদ ইবনে সাঈদ, মুয়াবিয়া, যাইদ ইবনে সাবিত। তবে کاتبين وحى কিভাবে ৫৪ জন কাতিবে ওয়াহীর নাম ও জীবনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩. রাসূল ﷺ যখন অনুস্থিত ছিলেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর খলিফা আবু বকর (র) -এর সময় যখন ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআন হৃদয়ে লালনকারী ৭০ জন হাফেয শহীদ হলেন, তখন উমার ইবনুল খাত্তাব এক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং কুরআনকে একটি কিতাব আকারে সংকলিত করার জন্য আবু বকর এ-এর কাছে আবেদন করেন। প্রথম প্রথম উমার এক এর সেই আবেদনে অনীহা প্রকাশ করলেও পরবর্তী সময়ে তিনিও এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারেন। অতঃপর আবু বকর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কুরআন লিপিবদ্ধকারী যাইদ ইবনু সাবিত-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন।

যাইদ ইবনু সাবিত (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদদের কারণে আবু বকর এ আমার নিকট লোক পাঠালেন। তখন তাঁর কাছে উমার এ-ও উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর এ বললেন, "উমার এক আমার কাছে এসে বলেছেন যে, কুরআনের বহু হাফেয ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এ জন্য আমার ভয় হচ্ছে যে, আরও অনেক জায়গায় যদি কুরআনের হাফেযগণ এমন ব্যাপকহারে শহীদ হন তাহলে কুরআনের বহু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন

সংকলনের আদেশ দিন। আমি বললাম, কী করে আমি এমন কাজ করব, যা রাসূলুল্লাহ করেননি! উমার বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা উত্তম কাজ।

উমার আমাকে এ বিষয়ে বারবার বলছিলেন। একপর্যায়ে আল্লাহ আমার অন্তর খুলে দিলেন যে বিষয়ে তিনি উমারের অন্তর খুলে দিয়েছিলেন এবং আমিও এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করলাম, যা উমার পোষণ করছেন।"

যাইদ বলেন যে- এরপর আবু বকর বললেন, "তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক, তোমার সম্পর্কে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ-এর ওয়াহী লিখতে। কাজেই তুমি কুরআনের অংশ খোঁজ করো এবং তা একত্রিত করো।"

যাইদ (র) বলেন, আল্লাহর শপথ! কুরআন খোঁজ করে একত্র করার নির্দেশ না দিয়ে যদি আমাকে পাহাড়গুলোর একটিকে স্থানান্তর করার দায়িত্ব অর্পণ করা হতো, তবুও আমার জন্য ভারী মনে হতো না। আমি বললাম, "কী করে আপনারা দুজন এমন একটি কাজ করবেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺকরেননি।" আবু বকর বললেন, "আল্লাহর শপথ! এটি একটি উত্তম কাজ।" আমি আমার কথা বার বার বলতে থাকলাম। একপর্যায়ে আল্লাহ আমার অন্তর খুলে দিলেন, যে বিষয়ে আবু বকর ও উমার এ-এর অন্তর খুলে দিয়েছিলেন। এবং তাঁরা দুজন যা ভালো মনে করলেন আমিও তা ভালো মনে করলাম। কাজেই আমি কুরআন খোঁজ করতে শুরু করলাম। খেজুরের ডাল, পাতলা চামড়ার টুকরা, সাদা পাথর ও মানুষের অন্তর থেকে আমি কুরআনকে সন্নিবেশ করলাম। সূরা তাওবার শেষ অংশ ... لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল ﷺএসেছেন.....(সূরা আত্-তওবা ৯/১২৮) থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এ অংশটুকু খুযাইমাহ কিংবা আবু খুযাইমাহর কাছে পেলাম। আমি তা সূরার সঙ্গে জুড়ে দিলাম। কুরআনের এ সংকলিত সহীফাগুলো আবু বকরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে ওফাত দিলেন। পরে উমারের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাঁরও ওফাত দিলেন। এরপর হাফসাহ বিনতে উমার-এর কাছে ছিল।

যাইদ ইবনে সাবিত (র) এর নেতৃত্বে উসমান ইবনে আফফান, আলী ইবনে আবী তালিব, আবু মূসা আল আশ'আরী, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ, উবাই ইবনে কাব, আবু হুরাইরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু দারদা, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ-সহ প্রমুখ সাহাবী উমার এর ঘরে একত্র হয়ে সেই সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করেন যেগুলোতে আল্লাহর রাসূল ﷺএর উপস্থিতিতে কুরআনের আয়াত লেখা হয়েছিল। এ ছাড়া সাহাবায়ে কেরামের মুখস্থ আয়াতও শোনা হয়। তাঁদের প্রত্যেককে বলা হয় নিজস্ব তিলাওয়াতকৃত আয়াতের পক্ষে অন্তত দুজন সাক্ষী উপস্থিত করতে। এভাবেই কুরআনের প্রতিটি আয়াত লিপিবদ্ধকরণের সময় খুবই সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করা হয়। লিপিবদ্ধকরণের পর সাহাবাদের সাধারণ সভায় কুরআনের অনুলিপিটি পাঠ করা হয়। এতে কারও কোনো আপত্তি দেখা দেয়নি। মোট ৩৩,০০০ সাহাবী একমত হয়েছিলেন যে, কুরআনের প্রতিটি বর্ণ পর্যন্ত সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অত:পর সেই মুসহাফ উমার ইবনুল খাত্তাব (র)- এর নিকট প্রেরণ করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে এই মুসহাফ হস্তান্তর করা হয় তাঁর কন্যা হাফসাহ (র)- এর কাছে।

৪. কুরআনের লিপিবদ্ধকরণ

সেই সময় আরবী লেখা হিজায অঞ্চলেই সাধারণত অধিক ব্যবহৃত হতো এবং হিজাযে ব্যবহৃত লিপিই আরবব্যাপি সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। সাহাবাগণ ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন যে, হিজাযীদের লেখার ধরনটি হযরত ইসমাইল (আ) ব্যবহার করেছিলেন। হিজাযের এই আরবী লিপির ধরন বা ধারণা সর্বপ্রথম পাওয়া গিয়েছে সেই ন্যাবাটিয়ান বা সামুদ গোত্রের কাছ থেকে, যারা পাথর কেটে ঘর তৈরি করত। তাদের ঘরগুলোতে ফলকের ওপর তাঁরা নিজেদের বৃত্তান্ত লিখে রাখত। সেখান থেকেই কালক্রমে এই হিজাযী লিপির আবির্ভাব।

ন্যাবাটিয়ানদের ফলকে প্রথম আরবী অক্ষরের ধারণা

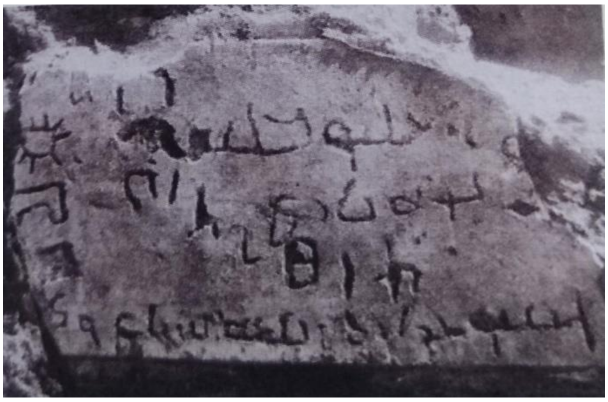

জর্ডানের জাবালে রাশ্মে খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে উদ্ঘাটিত ন্যাবাটিয়ানদের শিলালিপি

আরব উপদ্বীপের হিজায অঞ্চলে উদ্ভব হয় এই লিপি। তাই এর নাম হয় হিজাযী লিপি। মক্কা ও মদিনা হিজায অঞ্চলের অন্তর্গত। ইসলামের উত্থানের যুগে এই লিপিই সব সময় ব্যবহৃত হতো। সাঈদ ইবনুল আস ছিলেন তাঁর হাতের লেখার সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। তিনিই কুরআনের মুসহাফের সর্বপ্রথম লেখক ছিলেন। পশুর চামড়ায় হিজাযের প্রচলিত লিপিতে সেই মুসহাফটি লেখা হয়েছিল। অন্যান্য আরবী লিপিগুলোর তুলনায় হিজাযী লিপি কৌণিক এবং ডান দিকে ঝুঁকে থাকে। এই লিপিতে কোনো ফোঁটা বা স্বরচিহ্ন নেই, এটি শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে গঠিত। হিজাযী লিপিতে মা'ইল নামক একটি শৈলী (Calligraphy) রয়েছে, যা প্রাচীন কুরআনগুলোতে ব্যবহার হতো।

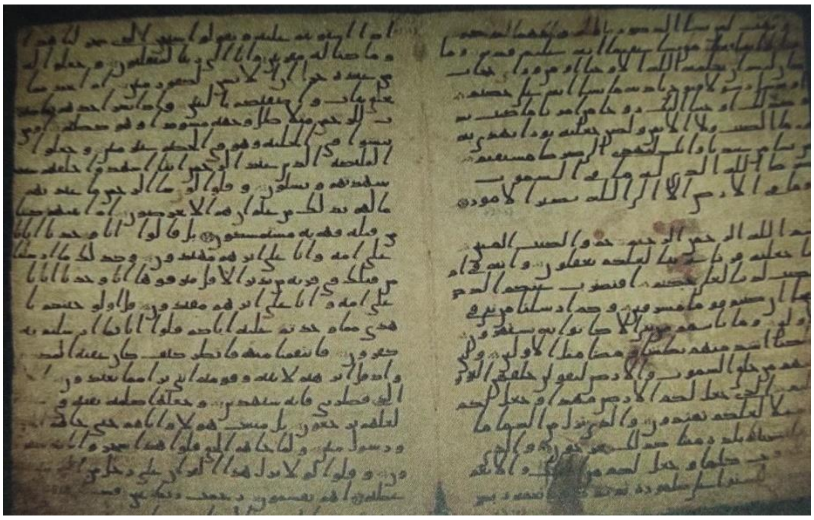

হিজরী প্রথম শতাব্দীর প্রাথমিক যুগের কুরআনের পাণ্ডুলিপি। সূরা শুরা এর ৪৯ নং আয়াতের শেষ অংশ থেকে সূরা আয যুখরুফ এর ৩২ নং আয়াতের কিয়দাংশ পর্যন্ত।

লিপি: হিজাযী, সংরক্ষণের স্থান: মাকতাবাতুল জামিউল কবির; সানা, ইয়েমেন।

(হাফসাহ (র) এর নিকট সংরক্ষিত মুসহাফ এটি নয়।)

তাশকীল বলা হয় হারাকাত অর্থাৎ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে। আর ই'জাম বলা হয় নুক্তা অর্থাৎ হরফে ব্যবহৃত বিন্দুকে।

সহীহ বুখারী, ৭১৯১

The Early Alphabet, পৃষ্ঠা: ৫২, The Development of The Arabic Scripts, পৃষ্ঠা : ১০

কুরআনের সংকলন

১. সাব'আতু আহরুফ

আল্লাহর রাসূল ﷺ- এর ওপর আরবী ভাষার মধ্যে সাতটি পদ্ধতিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূল ﷺবলেন—–

أَقْرَ أَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى حَرْفٍ فَرَا جَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلَ أَسْتَزِيدُهُ فَرِ يدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

আমাকে জিবরীল (আ) ১টি পদ্ধতিতেই কুরআন শেখাতেন। আমি তাঁকে আরও পদ্ধতিতে শেখানোর জন্য বলতে থাকলাম, ফলে তিনি আরও শিখাতে থাকলেন যতক্ষণ না সাতটিতে এসে থামলেন।

কুরআনের এই ৭টি পদ্ধতিকে বলা হয় الأحرف السبعةবা আল আহরুফুস সাবআই। أَحْرُفহলো حرفশব্দটির বহুবচন। অনেকের মতে এর অর্থ হলো 'আঞ্চলিক ভাষা' বা 'উপভাষা' (Dialect)।

অপর এক হাদীসে এসেছে যে, উমর ইবনে খাত্তাব (র) বলেন- আমি হিশাম ইবনে হাকীম -কে রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি। এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তার তিলাওয়াত শুনেছি। তিনি ভিন্নভাবে তিলাওয়াত পাঠ করেছেন; অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺআমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সালাতের মাঝে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাকে এ সূরা যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে?" সে বলল, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন।" আমি বললাম, "তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺআমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।" এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, "আপনি আমাকে সূরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে

শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺবললেন, "তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম, তুমি পাঠ করে শোনাও।" তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাল, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺবললেন, "এভাবেই নাযিল করা হয়েছে।" এরপর বললেন, "হে উমার, তুমিও পড়ো।" সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺবললেন, "এভাবেও কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত আহরুফে নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ করো।"

অনেকেই মত দিয়েছেন যে, হরফ বলতে আসলে উপভাষা বোঝানো হয়নি। যেহেতু উক্ত হাদীসে যে দুই জন সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, হিশাম ইবনে হাকীম ও উমার ইবনে খাত্তাব উভয়ই কুরাইশ বংশের। তাঁদের যুক্তি হলো, যদি হরফ বলতে উপভাষাই বোঝানো হতো তাহলে কুরাইশ ভাষারীতির অনুসারী দুই ব্যক্তির মাঝে মতের পার্থক্য হতো না। অপরদিকে ইবন আব্বাস হতে বর্ণিত রয়েছে যে, কুরআন ৭টি ভাষা-রীতিতে নাযিল হয়েছে। তিনি প্রতিটি ভাষারীতির নামও উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিস আবু উবাইদ মত দেন যে, আরবের ৭টি গোত্রীয় ভাষা কুরআনে রয়েছে। কোনো আয়াতে একটি শব্দ এক উপভাষা থেকে এসেছে আবার আরেক আয়াতের আরেকটি শব্দ হয়তো অন্য এক গোত্রের উপভাষা থেকে নেয়া হয়েছে।

সেই সম্ভাব্য সাতটি আহরুফ বা ভাষারীতি হচ্ছে:

১. কুরাইশ

২. হুযাইল

৩. সাকীফ

৪. হাওয়াযিন

৫. কিনানাহ

৬. তামীম

তামীমষণাত্রের ক্ষেত্রে আরও নির্দিষ্ট করে অধস্তন পুরুষ বনু দারম (بنو دارم)এর নাম পাওয়া যায়। ইমাম ইবনে জারীর (র) ৭ম ভাষারীতি হিসেবে খুযাআহ গোত্রের ভাষারীতির নাম উল্লেখ করেছেন।

কেউ কেউ হাওয়াযিন (هوازن) গোত্রের অন্তর্গত আল-আজার (العجر) শাখা গোত্রের চারটি উপগোত্রের ভাষারীতিকে চারটি আহরুফ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আবু আমা ইবনে আ'লা (র) এ বিষয়ে বলেন, "আরবদের মধ্যে বিশুদ্ধতম ভাষায় কথা বলে হাওয়াযিন গোত্রের ঊর্ধ্বতন অংশ।" উক্ত অংশই আল-আজার নামে পরিচিত। উপগোত্র চারটি হচ্ছে:

১. বনু আসআদ ইবন বকর (بنو اسعد ابن بكر)

২. বনু খায়ছাম ইবন বকর (بنو خيثم ابن بكر)

৩. বনু নাসর ইবন মুআবিয়াহ (بنو نصر ابن معاويه)

৪. সাকীফ (ثقيف)

উদাহরণ দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করি। আয়তনে তুলনামূলক ক্ষুদ্র বাংলাদেশের সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে। এমনকি একই গ্রামে নদীর এপার আর ওপারের মানুষের বাচনভঙ্গিতেও অনেক অমিল দেখা যায়। তেমনি তৎকালীন সুবিশাল আরব ভূখণ্ডের মাঝেও আলাদা আলাদা আঞ্চলিক ভাষার প্রচলন ছিল। একাধিক আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺজিবরীল (আ) থেকে ৭টি উপভাষায় কুরআন শিখে নিয়েছিলেন। একটি উপভাষার সাথে আরেকটি উপভাষার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাষাগত অমিল থাকলেও অর্থগত কোনো অমিল ছিল না। যেমন: সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় 'ছেলে'-কে বলা হয় 'ফুঁয়া', চট্টগ্রামে বলা হয় 'ফোয়া', উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে বলা হয় 'সাওয়াল', 'সোওল', 'সেইলে'। এ ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলভেদে 'পোলা', 'পুত', 'ব্যাটা', 'গ্যাল্লা' এ রকম একই শব্দের আরও বেশ কিছু আঞ্চলিক সমার্থক শব্দ পাওয়া যায়। উচ্চারণ যেমনই থাকুক, অর্থ

একই। ঠিক তেমনি আরবদের মাঝেও একই শব্দের অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমার্থক শব্দ ব্যবহৃত হতো। যেমন: তামীমী গোত্রের লোকেরা 'অ' অক্ষরটিকে 'তে' বলত এবং 'ناس' অর্থাৎ 'নাস' শব্দটিকে 'নাত' পড়ত। এটি ছিল কুরআনের বৈচিত্র্য এবং ভিন্ন ভাষাভাষীর পাঠকদের জন্য সুবিধাজনক অথচ এতে অর্থের পরিবর্তন হতো না। বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (র) একটি হাদীসে বলেন, "এগুলো এমনই, যেমন তোমাদের কেউ বলে 'আক্কাবিল' (এগোও), কেউ বলে 'হালুম্মা' (চলো), কেউ বলে 'তা'আল (এসো)।"

বেশ কিছু কারণে কুরআনের ৭ টি উপভাষা তখন বেশ প্রয়োজনীয় ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. ইসলামের প্রাথমিক সময়ে ওহীর মর্মকথা যাতে আরবের সর্বসাধারণের কাছে যথাযথ পৌঁছে যায় তাই ৭টি উপভাষায় কুরআন নাযিলের প্রয়োজন ছিল।

২. কুরআন সংরক্ষণের তাগিদে অন্যান্য উপভাষায় অভ্যস্ত মুসলিমদের জন্য যাতে তাঁদের নিজস্ব উপভাষায় কুরআন মুখস্থ করতে সহজ হয়।

৩. নিজস্ব উপভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে এমন ভেবে যেন উক্ত উপভাষায় অভ্যস্ত কাফিরদের ইসলামের প্রতি অন্তর নরম হয়।

প্রথম সারির মুসলিমগণের মাঝে যারা সাক্ষর ছিলেন তারা সহজেই নিজস্ব ভাষার। কোথাম পড়তে পারতেন। তবে আঞ্চলিক বা উপভাষাগত তারতম্যের কারণে ভাষার রূপে একাটি অপরটি থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম হতো, তার ওপর সেই সময় আরবী লিপির বর্ণ বা স্বরচিহ্নের পার্থক্য করার জন্য তেমন কোনো চিহ্ন ছিল না (যেমন: নুক্তা, হারাকাহ ইতাদি)। কিন্তু একটা সময় অনেক অনারব ইসলাম ধর্মগ্রহণ করছিল। ফলে উপভাষাগত কিছু বিভেদ সৃষ্টি হয়তে লাগলো। সেই সাথে গোত্রগুলোর মাঝে স্ব স্ব তিলাওয়াত-পদ্ধতি নিয়ে বড়াই ও প্রতিযোগিতা দেখা দিতে শুরু করলো।

সহীহ বুখারী, ৩০৪৭; সহীহ মুসলিম, ৮১৯

সহীহ বুখারী, ২২৮৭, সহীহ মুসলিম, ৮১৮

তাফসির ইবন কাসীর, ১ম খণ্ড

তাফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড

মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৩ তম খণ্ড

২. নবিজী ﷺ- এর যুগে সংরক্ষণ

আল-কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো রাসূল (স)-এর যুগ। কেননা তাঁর জীবদ্দশাতেই পুরো কুরআন ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়। এ সময়ে এ মহাগ্রন্থের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমন-

ক. হিফয প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ: কুরআন নাযিল প্রাক্কালীন সময়ে আরবে আইয়ামে জাহেলিয়া'র অজ্ঞানতা ও মুর্খতা বিরাজ করছিল। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বা লেখাপড়া জানা লোক এ সময় নিতান্তই বিরল ছিল। তাছাড়া এ সময় লেখার উপকরণও ছিল দুর্লভ। কিন্তু নিরক্ষর হলেও আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আরব কবিদের সুদীর্ঘ কাব্য এবং নিজেদের পরিপূর্ণ বংশতালিকা মুখস্থ করে রাখায় তারা অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করে আসছিল। কুরআনের অবতরণ শুরু হওয়ার পর তাদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এর সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

রাসূলুল্লাহ ﷺএর ব্যক্তিগত প্রয়াস: রাসূলুল্লাহ ﷺনিজে একজন অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ ছিলেন। তা সত্ত্বেও আল-কুরআনের যখন যেটুকু নাযিল হতো তিনি সাথে সাথে তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন। মুখস্থ প্রক্রিয়া শতভাগ নির্ভুল করতে ও নিখুঁত রাখতে জিব্রাঈল (আ)-এর সাথে সাথেই তিনি দু'ঠোঁট নেড়ে আয়াত মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। তিনি রাত দিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন, "জিব্রাঈল

(আ) যখন ওহী নিয়ে আসতেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট দ্রুত নাড়তেন। এটা যে তাঁর জন্য কষ্টকর হতো তা তাঁর ঠোঁট নাড়া দেখেই বুঝা যেত। তাই মহান আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন-

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَ جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

'তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা তার সাথে সঞ্চালন করো না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার। (সূরা কিয়ামাহ: ১৬-১৭)। এ ঘোষণায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এ কুরআনকে আপনার বক্ষে সংরক্ষণ করা এবং একে পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। তাই আমি যখন তা পড়ি তখন আপনি তার অনুসরণ করুন। যখন আমি কুরআন নাযিল করি তখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এরপর তা বর্ণনা করা আমার কাজ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এরপর জিব্রাইল (আ) যখনই ওহী নিয়ে আসতেন, নবী (স) মাথা নুইয়ে চুপ করে শুনতেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী পুরো ওহীই যথাযথভাবে পড়তে পারতেন। (সহীহ বুখারী) কাজেই কুরআন মাজীদের যতটুকু নাযিল হতো রাসূলুল্লাহ (স) সাথে সাথে তা নিখুঁতভাবে আতাই করে ফেলতেন। এভাবে কুরআন নাযিল অব্যাহত থাকায় হযরত রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই জীবন্ত কুরআনে পরিণত হন। কুরআনের প্রতিটি হরফ আল্লাহর অসীম রহমতে তাঁর স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে ঠাঁই করে নেয়।

সাহাবীগণের (রা) হিফয: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ আল-কুরআন হিফয বা মুখস্থ করে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। কোনো আয়াত নাযিল হলে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (স) তা পাঠ করে শুনাতেন, পরে তাঁর সাহাবীদেরকে তা পাঠ করে শুনাতে বলতেন। এভাবে প্রায় সকল সাহাবীরই (রা) নাযিলকৃত অংশটুকু তাৎক্ষণিতভাবে মুখস্থ হয়ে যেত। মুখস্থ করার পর সাথে সাথে তা রাসূলুল্লাহ (স)কে শুনাতে হতো বলে কারো যদি কোনো ভুল থেকে যেত সাথে সাথে তা সংশোধন করা সম্ভব হতো। ফলে কারো পক্ষে ভুলভাবে বা অশুদ্ধভাবে কুরআন মুখস্থ করার সুযোগ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে যাঁরা কুরআন মুখস্থ করতেন তাদেরকে বলা হতো কারী। ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম বেদনায়ক হত্যাকাণ্ড বীর ই মাউনের ঘটনায় ৭০

জন কারী সাহাবী (রা) শহীদ হন। ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ কারী সাহাবী (রা)-এর সংখ্যা সত্তরের অধিক। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে সাহাবী (রা)দের অনেকেই কুরআন হিফয করতেন। এমনিতেই আরবরা বিস্ময়কর স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন, তদুপরি কুরআন হিফয করা ছিল গৌরব ও মর্যাদার কাজ, তাই তাঁরা অবলীলাক্রমে কুরআন মুখস্থ করতেন। এ সময় প্রসিদ্ধ কারীদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দীক, উমর বিন খাত্তাব, উসমান বিন আফফান, আলী ইবন আবূ তালিব, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবন উমর, আব্দুল্লাহ ইবন আমর, সালিম, উবাই বিন কাআব, মুআয বিন জাবাল, তালহা, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আবু হুরায়রা, আয়শা, হাফসা, উম্মু সালমা প্রমুখ সাহাবীগণ (রা)ছিলেন অন্যতম। তাছাড়া পারিবারিকভাবেও সাহাবী (রা)গণ আল-কুরআন তিলাওয়াত করতেন। গভীর রাতে তাঁদের ঘর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের পবিত্র ধ্বনি উত্থিত হতো। রাসূলুল্লাহ (স) রাতের বেলায় তাঁদের তিলাওয়াত শুনতে বাইরে বের হতেন। হিজরতের পূর্বে মুসআব বিন উমাইর ও আব্দুল্লাহ বিন উম্মি মাকতুম (রা) কুরআন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে মদীনা প্রেরিত হয়েছিলেন।

কাজেই সাহাবী (রা) গণের সমন্বিত হিফয প্রক্রিয়ায় কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের কাজে বিপুল গতিময়তা সৃষ্টি হয়। বলা যায় তাঁদের প্রত্যক্ষ অবদানেই কুরআন সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি এতটা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺও জিব্রাঈল (আ)-এর পুনরাবৃত্তি:

কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম পদ্ধতি ছিল এর পুনরাবৃত্তি। প্রতি রমযানে মুহাম্মাদ (স) ততদিন পর্যন্ত নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতমালা জিব্রাঈল (আ)-এর কাছে এবং জিব্রাঈল (আ) তাঁর কাছে পুনরাবৃত্তি করতেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে- প্রতি রমযানে জিব্রাঈল (আ) পুরো কুরআন মাজীদ একবার রাসূলুল্লাহ (স)কে তিলাওয়াত করে শোনাতেন। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখস্থ করা আয়াতমালার মধ্যে কোনো ভুল হতে পারতো না। তাঁর নিকট থেকে শিখতেন সাহাবী (রা)গণ। ফলে তাঁদের মুখস্থ করার বিষয়টিও হতো সম্পূর্ণ নির্ভুল। এভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর

ব্যক্তিগত চেষ্টা, সাহাবী (রা) গণের সমন্বিত প্রয়াস এবং জিব্রাঈল (আ)-এর সযত্ন তত্ত্বাবধানে আল-কুরআন হিফয করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। সকলের হিফযের বিষয় এক ও অভিন্ন হওয়ায় কারো পক্ষেই ভুলের ওপর থাকা সম্ভব ছিল না বিধায় হিফয প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবেই কুরআন সংরক্ষিত হতে থাকে। বস্তুত কুরআনের মতো একটি বিশাল গ্রন্থ আল্লাহর অপার রহমতেই কণ্ঠস্থ রাখা সম্ভব। যাঁরা এর জন্য চেষ্টা করেন আল্লাহ তাঁদেরকে এ তাওফীক দান করেন। বর্তমানের কুরআন হিফযকারীদের দিকে লক্ষ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

খ. লিখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ : সাহাবীদদের (রা)লিখন: যদিও কুরআন নাযিলকালীন সময়ে লিখতে জানা লোকের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম তা সত্ত্বেও যাঁরা লেখাপড়া জানতেন তাঁরা মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখেও আল-কুরআনের সংরক্ষণ অব্যাহত রাখেন। এ সময়ে লেখনীর সাজ-সরঞ্জামের অকল্পনীয় অপ্রতুলতার জন্য সাহাবী (রা)গণ চামড়া, পাথর, পাতা, হাড়, প্রভৃতিতে নিদারুণ ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে আয়াতসমূহ লিখে রাখার কাজে আঞ্জাম দিয়েছেন। এ প্রচেষ্টায় তাঁরা প্রথমে লিখিত অংশের সাথে নিজেদের মুখস্থকৃত অংশের সামঞ্জস্য বিধান করতেন। তারপর অধিকতর নিখুঁত ও সুনিশ্চিত নির্ভরতার জন্য অন্যদের লিখিত ও মুখস্থ কুরআনের সাথে মিলিয়ে সংরক্ষণের বিশ্বাসযোগ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখতেন। তাঁদের এ প্রচেষ্টার ফলে মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখেও কুরআন সংরক্ষণের কাজ চলতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺকর্তৃক ওহী লিখক নিয়োগ: রাসূলুল্লাহ (স) নিজে লিখতে পড়তে জানতেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনী মু'জিযার অংশ হিসেবেই তাঁরে নিরক্ষর রেখেছেন। কেননা তিনি যদি সাক্ষর হতেন তাহলে লোকদের পক্ষে বলা সহজ হতো যে, এ কিতাব তিনি লিখেছেন। যেহেতু তিনি লিখতে পড়তেই জানতেন না সুতরাং কেউ আর এটা বলতে পারবে না যে, এ কিতাব তাঁর নিজের রচনা। কুরআনে প্রথম যে বাণী এসেছে তাতে 'কলম' ব্যবহারের কথা আছে। আল কুরআনকে 'আল কিতাব' বলে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কিতাব তো তাকেই বলা হয় যা কলম দ্বারা লিখিত। নিয়মতান্ত্রিকভাবে কুরআন সংরক্ষণের কাজ সম্পাদনের জন্য তাই নবী (স)

কাতিবে ওহী বা ওহী লেখক নিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে ৪২ জন কাতিব ছিলেন, যারা ওহী নাযিল হলে তাঁর নির্দেশে তা লিপিবদ্ধ করতেন। এঁদের মধ্যে যায়দ ইবন সাবিত, আবু বকর সিদ্দীক, উমর ইবন খাত্তাব, উসমান ইবন আফফান, আলী ইবন আবূ তালিব, যুবায়র বিন আওয়াম, আব্দুল্লাহ বিন সা'দ, খালিদ বিন সাঈদ, আবান বিন সাঈদ, উবাই বিল কাআব, হানযালা বিন রাভী, মুআইকাব বিন আবি ফাতিমা, আব্দুল্লাহ বিন আরকাম, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুগীরা বিন শুবা, মুআবিয়া, আমর বিন আস, আব্দুল্লাহ বিন সারাহ প্রমুখ সাহাবী (রা)দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

এ সময়ে ওহী লিখনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সাহাবাগণ (রা)বিভিন্ন বর্ণনা পেশ করেছেন। এ সম্পর্কে যায়দ বিন সাবিত (রা) বলেন, "নাযিল শেষ হলে আমি দুম্বার চামড়া, হাড় ও লিখন উপযোগী অন্য কিছু নিয়ে হাজির হতাম। লেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন- "যা লিখেছো আমাকে পড়ে শোনাও।" আমি লিখিত অংশ পড়ে শোনাতাম। কোথাও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে নবী (স) সাথে সাথে শুদ্ধ করে দিতেন। এরপর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্যদের সামনে তিলাওয়াত করতেন।" লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো হযরত রাসূলুল্লাহ (স) নিজ তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করেন। আর এভাবে রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় পর্যায়ক্রমে সমগ্র কুরআন মাজীদ হিফযকরণ ও লিখন প্রক্রিয়া অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পন্থায় সুসম্পন্ন হয়।

৩. খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগের সংরক্ষণ:

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা) খিলাফতে অভিষিক্ত হওয়ার পর কুরআন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া নতুন যুগে প্রবেশ করে। তাঁর শাসনামলে উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর পরামর্শে ও যায়দ বিন সাবিত (রা)-এর তত্ত্বাবধানে সমগ্র কুরআন গ্রন্থাবন্ধ করা হয়। তৃতীয় খলীফা উসমান ইবন আফফান (রা) মূল কুরআন থেকে অতিরিক্ত

পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে তা খিলাফতের সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। ফলে আল-কুরআনের সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি সারা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালের সংরক্ষণ: উমাইয়া খিলাফতকালে অনারবদের নিকট আল-কুরআনের সংরক্ষণ সহজসাধ্য করে তুলতে আবুল আসওয়াদ দুয়ালী, ফারাহ প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যাকরণবিদদের সহযোগিতায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আল-কুরআনে হরকত ও নুকতা সংযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে লেখার আধুনিকতম ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়। ছাপাখানা আল-কুরআনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সর্বজনীন ও সহজ করে তোলে। এখন বিশ্বের দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠী একদিকে যেমন সর্বাধুনিক যন্ত্রকৌশলে ছাপানো নির্ভুল গ্রন্থাবদ্ধ কুরআন নিজেদের নিকট সংরক্ষণ করেন, তেমনি অসংখ্য মুসলিম গোটা কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে এ মহাগ্রন্থের সংক্ষণ কাজ সকল দিক থেকেই নিরাপদ ও সংশয়হীন রাখেন। ফলে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলিম সাধারণ একটি ই'রাবের গরমিল করেও কুরআন তিলাওয়াত করেন না। বস্তুত মহান আল্লাহ স্বয়ং কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের যে দায়িত্ব নিয়েছেন এ হচ্ছে তারই বাহ্যিক রূপ।

৪. উসমান (র.) এর যুগ

তৃতীয় খলিফা উসমান-এর যুগে ইসলামী ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান অভিযানে দামেস্ক ও ইরাক থেরে আগত মুসলিম সৈন্যদের মাঝে কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে একটি বিরোধ দেখা দিলে। হুজাইফাহ ইবনুল ইয়ামান সেই অভিযান থেকে মদীনায় ফিরে উসমান এ-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে এই সমস্যা নিরসন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পরাম দিলেন। হিজরতের ২৫ তম বছরে (৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) যাইদ ইবনে সাবিত এক-এর নেতৃত্বে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, সাইদ ইবনুল-আস এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস এর একটি প্রতিনিধিদল গঠন করেন উসমান। যাইদ ব্যতীত তাঁদের সকলেই কুরাইশ গোত্রের ছিলেন। উসমান তাঁদের দিকনির্দেশনা দিয়ে দেন যে, কুরাইশ্যে উপভাষাটি

যদি যায়েদ-এর তিলাওয়াতের বিপরীত হয় তাহলে যাতে কুরাইশদের উপভাষাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যেহেতু মুহাম্মাদ কুরাইশ গোত্রের ছিলেন। হাফসাহ থেকে পূর্বে সংকলিত মুসহাফটি সংগ্রহ করা হয় এবং কুরাইশদের উপভাষায় লিপিবদ্ধ করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। পূর্বের সেই মুসহাফটিতে সূরাগুলোকে একে অপর থেকে পৃথক অবস্থায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। আর এদিকে অন্যান্য সাহাবীদের ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপিগুলোতেও সূরার ক্রমে ভিন্নতা ছিল। সেগুলো তাঁর নিজস্ব তিলাওয়াতের সুবিধার্থে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। অনেকে ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন টীকা প্রদান করেছিলেন। আবার অনেকের পাণ্ডুলিপি ছিল অসম্পূর্ণ। আলী (র) এর পান্ডুলিপিতে নাযিলের ক্রমানুসারে (মাক্কী ও মাদানী) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ-এর পাণ্ডুলিপিতে দৈর্ঘ্য অনুসারে সূরাগুলো সাজানো ছিল। কিন্তু উসমান-এর তত্ত্বাবধায়নে সূরাগুলোকে সেই ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয় যে ক্রমে সাহাবাগণ আল্লাহর রাসূল থেকে শিখে নিয়েছিলেন।

কুরআনের উপভাষা নিয়ে যাতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি না হয় এবং অন্যান্য সাহাবাগণের ব্যক্তিগত মুসহাফগুলো থেকে যাতে ভবিষ্যতে কোনো বিরোধ সৃষ্টি না হয় তাই উসমান -এর নির্দেশে সাহাবাগণ তাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ের অনুলিপিগুলো আগুনে ভস্মিভূত করে ধ্বংস করে দেন। এ কারণে শিয়া সম্প্রদায় উসমান-কে কুরআন ধ্বংসকারী ও পরিবর্তনকারী বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। অথচ আলী নিজেও বিনা বিরোধে তাঁর নিজস্ব অনুলিপিটিকে ধ্বংস করেছিলেন।

নতুন মুসহাফের মোট সাতটি কপি প্রস্তুত করা হয় এবং সেগুলো একজন করে ক্বারীসহ বাহরাইন, দামেস্ক, বসরা, কুফা, ইয়েমেন ও মক্কায় প্রেরণ করা হয় এবং মূল মুসহাফটি মদীনায় রেখে দেয়া হয়। এই ধারণাও করা হয় যে, সেই কপিগুলো মিসর এবং জাযিরাতেও প্রেরণ করা হয়েছিল। কুরআনুল কারীমকে কিতাব তথা মুসহাফ আকারে সংকলনের পর এর অনুলিপি প্রস্তুতের মাধ্যমে মানুষের নিকট কীভাবে কুরআন পৌঁছে দেয়া যায় এই চিন্তাধারার নতুন এক অধ্যায়ের পথিকৃৎ উসমান। তিনি পরবর্তী সময়ে কুরআনের তিলাওয়াত ও লিখনীর ওপর বিশেষ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। উসমান-

এর কাছে যে অনুলিপি ছিল সেটিকে المصحف الإمام(আল মুসহাফুল ইমাম) বা প্রধান মুসহাফ বলা হতো। পৃথিবীব্যাপী আজ যেই সকল মুসহাফ অনুসরণ করা হয় তার সাথে সেই প্রধান মুসহাফের মৌলিক কোনো তারতম্য নেই।

তথ্যসূত্র: কুরআনিক স্টাডিজ,

মালামিহু ফিত তাজউইদ

জায়েদ (র.) এর গবেষণা পদ্ধতি

হজরত জায়েদ (রা.) নিজে কোরআনে হাফেজ হওয়া সত্ত্বেও এককভাবে কুরআন সংকলনের গুরুদায়িত্বটি আঞ্জাম দেননি, বরং তিনি চারটি পদ্ধতিতে কোরআন সংকলন করতেন। এক. কোনো আয়াত পাওয়া গেলে সর্বপ্রথম তা নিজের হিফজ ও মুখস্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। দুই. হজরত উমর (রা.)ও হাফেজ ছিলেন। বর্ণিত আছে যে তিনিও আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে জায়েদ (রা.)-কে সহযোগিতা করতেন। তিন. কোনো আয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা হতো না যতক্ষণ না দুজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিতেন যে এ আয়াত রাসুল ﷺএর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অথবা সেগুলো রাসুল ﷺ- এর মৃত্যুর আগে তাঁর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুরা তাওবার শেষ আয়াতটি যখন কেবল হজরত আবু খুজাইমা (রা)-এর কাছে পাওয়া গেছে তখন এ সূত্রে সেটিকে গ্রহণ করা হয়েছে যে জীবদ্দশায় রাসুল ﷺসে সাহাবির একজনের সাক্ষ্যকে দুজনের সাক্ষ্যের সমতুল্য ঘোষণা করে গেছেন। চার. অবশেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে সে আয়াতগুলোর সমষ্টিকে বিভিন্ন সাহাবির ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত কোরআনের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হতো।

পূর্ণ কুরআনকে সর্বপ্রথম একত্র করার ইতিহাস

ছিদ্দিকে আকবর হজরত আবু বকর (র)-এর খেলাফতকালে ইসলামের অন্যতম ঘোর শত্রু মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে প্রায় বারশত মুসলিম সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হন তন্মধ্যে হাফেজ ও কারীরাও শহীদ হন। এত বিপুলসংখ্যক হাফেজে কুরআন শহীদ হওয়ায় সায়্যিদুনা উমারে ফারুক (র) খুবই মর্মাহত হলেন এবং ভবিষ্যতে এভাবে হাফেজে কুরআন শহীন হলে এক সময় হাফেজে কুরআন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলেন। বিধায় তিনি, খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত আবু বকর (র)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং সম্পূর্ণ কুরআন একত্র করার প্রতি উৎসাহিত করলেন। কিন্তু হজরত আবু বকর (র) বিষয়টি অগ্রাহ্য করলেন, এতদসত্ত্বেও হজরত উমর (র) পিছপা হলেন না বরং বারবার বলতেই থাকলেন, অবশেষে হজরত আবু বকর রা:-এর এ বিষয়ে বক্ষ খুলে গেল তাই পূর্ণ কুরআন একত্র করার অনুমতি দিলেন, অবশেষে হজরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (র)-কে ডাকলেন এবং পূর্ণ কুরআন একত্র করার নির্দেশ দিলেন। কুরআনের প্রথম একত্রিত সেই কপি আবু বকরের কাছেই তার ওফাত পর্যন্ত রয়ে গেল অতঃপর তার ওফাতের পর কুরআনের এ কপি হজরত উমর ফারুক রা:-এর কাছে ছিল তিনি ওফাত বরণের পর তারই কন্যা রাসূল সা:-এর স্ত্রী হজরত হাফছা (র)-এর নিকট রাখলেন অতঃপর কুরআনের এই মূল কপির অনুসরণ করে আরো অনেক কফি করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থানান্তর করা হলো।

হজরত উসমান (র)-এর খেলাফতকালে কুরআন সংরক্ষণ :

যখন ইসলামের বিজয় ব্যাপক হতে লাগল এবং বিভিন্ন দেশের অনারবগণ প্রচুর পরিমাণে মুসলমান হতে শুরু করল যাদের মাতৃভাষা আরবি না হওয়ার কারণে তারা আরবি হরফগুলো সাধারণত সহিহ শুদ্ধভাবে আদায় করতে পারত না। এ ছাড়াও খোদ আহলে আরবদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এ ছাড়াও হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় যখন আরমিনিয়া ও আজারবাইজান জয় হলো এবং শাম ও ইরাকের

সৈনিকেরা একত্র হলো তখন তাদের মধ্যে হয়রান করার মতো কেরাত ভুল দেখা গেল এমনকি প্রত্যেকেই নিজের কেরাতকে সহিহ শুদ্ধ দাবি করার শুরু করল। তখন হজরত হুজাইফা (র) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হজরত ওসমান রা:-কে অবগত করলেন এবং এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ করলেন। হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, সাইদ ইবনে আছ এবং আবদুর রহমান ইবনে হারেছকে পুনরায় কুরাইশের ভাষায় হাফছা রা:-এর কাছে সংরক্ষিত কপির অনুরূপ একাধিক কপি লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিলেন। কপিগুলোকে যথাক্রমে মক্কা, মদিনা, শাম, বসরা এবং কুফায় প্রেরণ করলেন। পরিশেষে এক কপি হজরত ওসমান (র) নিজের কাছে রাখলেন।

তথ্যসূত্র: মুফতি শাহেদ রহমানি

কুরআন সহজকরণ

১. হারাকাত ও নুক্তার প্রাথমিক রুপ

কুরআন তিলাওয়াতের শুদ্ধতা যাতে বজায় থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আলী (র) তাঁর খিলাফাতকালে আবুল আসওয়াদ আল দুআলি নামক একজন বিখ্যাত ব্যাকরণবিদকে আরবীর লিখিতরূপে বিভিন্ন চিহ্ন ও লক্ষণ যুক্ত করার নির্দেশ দেন। উক্ত আবুল আসওয়াদ আল দুআলি-ই মূলত আরবী ভাষার প্রথম ব্যাকরণবিদ হিসেবে বিবেচিত। তাঁকে আরবী সাহিত্যের জনক হিসেবেও অভিহিত করা হয়। অন্যান্য বর্ণনায় পাওয়া যায় তৎকালীন বসরার গভর্নর যাইদ বিন আবু সুফিয়ান কিছু চিহ্ন উদ্ভাবন করতে উৎসাহিত করেন, যাতে কুরআন পাঠ প্রত্যেকের জন্য সহজ হয়। কিন্তু দ্বীনে নতুন কোনো বিষয় সংযোজন হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে আবুল আসওয়াদ উক্ত কাজে হস্তক্ষেপ করতে পছন্দ করেননি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। একদিন আবুল আসওয়াদ ও তাঁর মেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর মেয়ে তখন বলল:

مَا أَجْمَلُ السَّمَاءِ

আকাশের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসটি কী?

তিনি উত্তর দিলেন, “নক্ষত্ররাজি" সে বলল, "না আমি বোঝাচ্ছি, আকাশটি কত সুন্দর!" তিনি বলেন, "তুমি যদি এটা বোঝাতে চাও তাহলে তোমার এভাবে বলা উচিত ছিল:

مَا أَجْمَلَ السَّمَاءَ

ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল 'আয়ান, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬৬৩

অর্থাৎ বাক্য বা শব্দের সমাপ্তিতে ব্যবহৃত স্বর (ই'রাব) অর্থ পরিবর্তন করে ফেলে। আবার আরেক ঘটনায় পাওয়া যায়, তিনি একদিন কিছু লোককে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে শোনেন,

وَ أَذَنُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِى مِنَ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

এবং মহান হজ্জের দিনে এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি ঘোষণা যে, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসুলও।

উক্ত আয়াত তিলাওয়াতের সময় তারা 'রাসূলুহু' এর পরিবর্তে ভুলবসত কারণে 'রসূলিহি' পড়ে ফেলে। ফলে অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে যায়। ভুল করার কারণে অর্থ হয়ে যায়, "নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিক ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত।" এই ঘটনা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে আরবী ব্যাকরণ নথিভুক্ত করা দরকার। তিনি একজনকে নিয়োগ দিলেন এবং বললেন যে, "তোমার সামনে আমার এই কুরআন রয়েছে। আমি তিলাওয়াত করছি, যখন আমি কোনো শব্দ পড়ার সময় 'উ' উচ্চারণ করব তখন লাল কালি দিয়ে একটি গোল চিহ্ন বর্ণের শেষভাগে বসাবে। আর যখন আমাকে মুখ খুলতে দেখবে অর্থাৎ 'আ' উচ্চারণ করতে দেখবে তখন বর্ণের ওপরে লাল কালির গোল চিহ্ন লিখবে। এবং যখন 'ই' উচ্চারণ

করব তখন চিহ্নটি লিখবে নিচে। এভাবে বিন্দুর মাধ্যমে হারাকাতের প্রচলন শুরু হয়, সাকীনের জন্য ব্যবহার করা হত দুটি বিন্দু। এই চিহ্নগুলোকে বলা হতো شكل (শাকল)। 'বাঁধা' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বর্তমান সময়ে এসে এই চিহ্নগুলোকে বলা হয় تَشْكِيْل(তাশকীল), যাকে আমরা হারাকাহ, হারাকাত বা হরকত নামে চিনি। এভাবেই হারাকাতের উপস্থিতি আসে এবং পরবর্তী সময়ে তা পরিবর্তিত হয়ে অক্ষরের ওপর দম্মা ও ফাতহা এবং নিচে কাসরাহ চিহ্নে রূপান্তরিত হয় যা এখন পর্যন্তও প্রচলিত।

ইবনে নাদিম, আল ফিহরিস্ত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৮৮

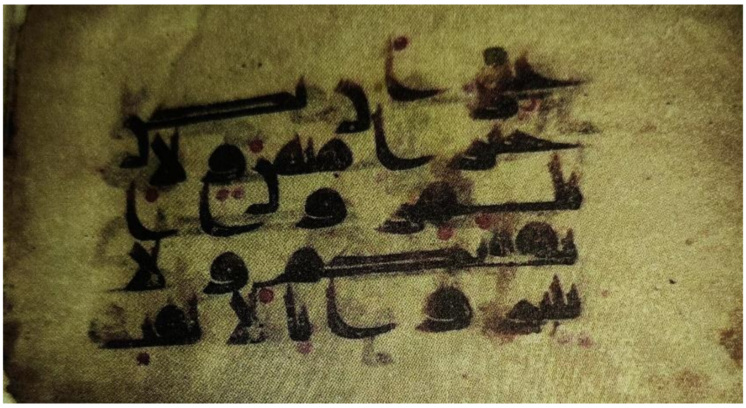

আবুল আসওয়াদ (র)-এর পদ্ধতির তাশকীল

অপরদিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবী অক্ষরমালার মাঝে কিছু একক অক্ষর ছিল যেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ ছিল। যেহেতু আরবরা তাদের ভাষায় পারদর্শী ছিল তাই তাদের এতে কোনো সমস্যা হতো না। এ ছাড়া অধিকাংশ সাহাবীদের অন্তরেই কুরআন সংরক্ষিত ছিল তাই কুরআন দেখে পড়ার তেমন প্রয়োজনীয়তাও তখন ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অনারবরা ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করল তখন তাদের জন্য একই অক্ষরের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ শনাক্ত করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াল। ফলে কুরআন তিলাওয়াতের মতো অশেষ ফযিলতপূর্ণ একটি আমল থেকে তাঁরা পিছিয়ে যেতে থাকে। তখনই মূলত একই রকম উচ্চারণের অক্ষরগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষরের ওপর বা নিচে এক বা একাধিক চিহ্ন সংযুক্ত করা হয়। এই চিহ্নগুলোকে বলা হয় إعجام

(ই'জাম)। যার অর্থ: অস্পষ্টতা থেকে মুক্তি। বর্তমানে আমরা এই চিহ্নগুলোকে নুক্তা নামে চিনি। ই'জাম বা নুক্তা ব্যতীত অক্ষরের মূল আকৃতিটিকে বলা হয় رسم(রসম)।

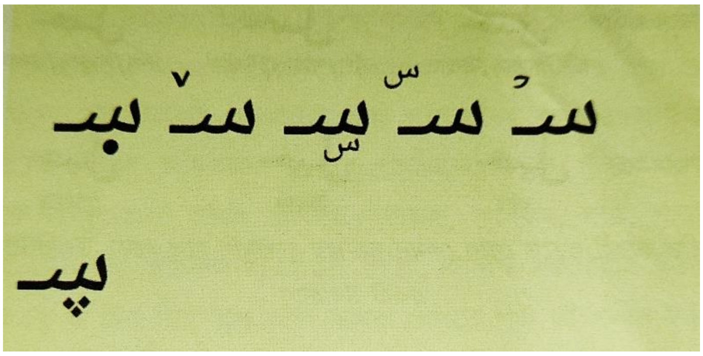

ই'জামের প্রাথমিক রূপ

আরবী অক্ষরে আবুল আসওয়াদ এ-ই প্রথম ই'জাম যুক্ত করেন বলে ধারণা করা হয়। যেমনটি আহমাদ আল কলকশন্দি তাঁর কিতাবে এনেছেন:

أول من وضع النحو أبو الأسود الدولي، بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب كرم الله وجهه وهو أول من نقط المصاحف النقط الأول على
الاعراب

আবুল আসওয়াদ আদ দুআলি প্রথম ব্যক্তি, যিনি আরবী ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন,আমিরুল-মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (র)-এর আদেশে তিনিই সর্বপ্রথম মুসহাফের শব্দগুলোর ওপর বৈয়াকরণ চিহ্নের পর নুক্তা প্রয়োগ করেন।

আরেক মত থেকে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম ই'জাম যুক্ত করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার অথবা নাসের বিন 'আসীম। তাঁরা উভয়ই ছিলেন আবুল আসওয়াদের ছাত্র।

صبح الأعشى في صناعة الإنشا, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৪২০

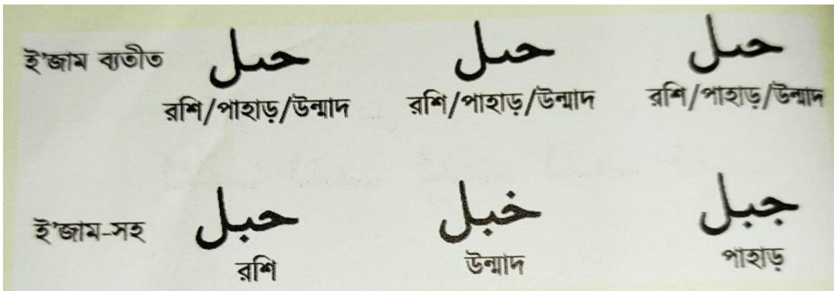

ই'জাম ব্যতীত আরবী পড়তে গেলে কেমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো, উপরিউক্ত চিত্র এর একটি উদাহরণ

কুরআনে এসব সংযোজনে প্রাথমিক পর্যায়ে সামান্য কিছু বিরোধিতা ছিল। ইবনে উমার (র) এসব সংযোজনের বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য অন্যরা এটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন যেহেতু এই সংযোজনের ফলে কুরআনের যথাযথ তিলাওয়াত নিশ্চিত হয়েছে। সাহাবাদের যুগের পর থেকে আবুল আসওয়াদের এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। মদীনার লোকেরা স্বরবর্ণের জন্য (তানউইন, তাশদীদ, তাকফিফ, সুকুন, ওয়াসল এবং মাদ) লাল কালির বিন্দু ব্যবহার করত এবং হামজার জন্য হলুদ কালির বিন্দু ব্যবহার করত বলেও জানা যায়।

২. হারাকাত ও নুক্তার বর্তমান রূপ

আবুল আসওয়াদ (র)- এর হারাকাতের পদ্ধতি সেই সময়ে ব্যাপক কার্যকর হলেও বড় আকারের লাল বৃত্তগুলো ছোট আকারের লিপিগুলোতে এবং তুলনামূলক ছোট আকারের মুসহাফগুলোতে ব্যবহার করা বেশ কঠিন ছিল। এ ছাড়া একটা সময় যখন ব্যাপকসংখ্যক মুসহাফ হাতে লেখা শুরু হয়েছিল, আবুল আসওয়াদের পদ্ধতিতে ভিন্ন রং দিয়ে তাশকীল যুক্ত করা ছিল সময়সাপেক্ষ বিষয়। আবার চিহ্নগুলো সবই বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল। কোনোটার ওপরে বিন্দু, কোনোটার নিচে, কোনোটার পরে, কোনোটার ওপর দুটা বিন্দু এভাবে একইরকম চিহ্ন হওয়ায় হাতে লেখার সময় ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল এবং তা ই'জাম অর্থাৎ নুক্তার সাথেও সাদৃশ্য ছিল, যা অনেক সময় ভুল তিলাওয়াতের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এসব কারণেই হারাকাতের প্রথম প্রবক্তা ইমাম আবুল আসওয়াদ দুআলি (র)-এর পদ্ধতির মাঝে কিছু পরিবর্তন

আনার প্রয়োজন বোধ করেন ব্যাকরণবিদ খলীল ইবনে আহমদ আল ফারাহিদী (র)। তিনিই প্রথম আরবী ভাষার অভিধান 'কিতাবুল 'আইন' রচনা করেন। 'আইন' আরবী বর্ণমালার অন্যতম গভীরতম অক্ষর। এ ছাড়া 'আইন' এর অর্থ বিশাল মরুভূমির মাঝে পানির উৎস। এই অভিধানের 'উৎস' নামকরণে আল ফারাহিদির লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়। অভিধান হলো আরবী শব্দভান্ডার এবং শব্দকোষের ব্যুৎপত্তিগত উৎস প্রাপ্তির স্থান। তিনিই আবুল আসওয়াদ (র)-এর পদ্ধতিকে কিছুটা পরিবর্তন করেন, যা তুলনামূলক সহজ এবং অধিক কার্যকর। ফাতহা, কাসরাহ, দম্মা, শাদ্দাহ, সুকুন, তানউইন, হামযাতুল ওয়াসল, হামযাতুল ক্বাত্বা', আলিফ খঞ্জারিয়াহ ইত্যাদি চিহ্নের যেই সহজতর ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ আজ আমরা দেখতে পাই তা খলীল ইবনে আহমদ আল ফারাহিদি (র)-এর অবদান। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত আরবী লিপির জন্য সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাঁর প্রবর্তিত চিহ্নগুলো।

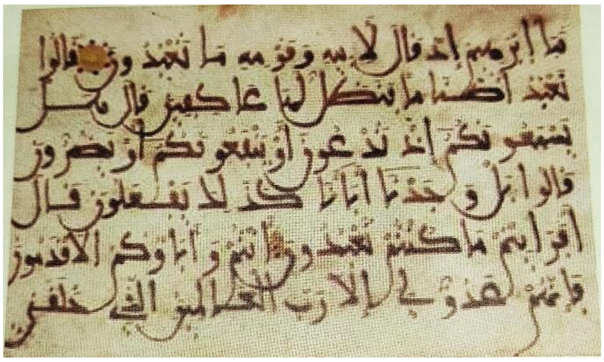

আল ফারাহিদি এর প্রবর্তিত নতুন তাশকীল পদ্ধতি-সংবলিত কুফিক স্ক্রিপ্টে লেখা হিজরীর ৪র্থ শতাব্দীর মুসহাফের অংশ।

মূলত তিনি তাশকীলের চিহ্নগুলোকে ছোট ছোট অক্ষর দ্বারা প্রতিস্থাপন করেছিলেন। যেমন 'আ' উচ্চারণ বোঝাতে অক্ষরের ওপর বাঁকা করে ছোট আলিফ (٠) ব্যবহার করেন, যা ফাতহাহ বা যবর নামে পরিচিতি পায়। যখন অক্ষরটিকে কিছুটা লম্বা করে (মাদ দিয়ে) পড়তে হয় তখন ছোট আলিফটি অক্ষরের ওপর সোজাসোজি বসানো হয় (٠ٰ), যাকে বলা হয় আলিফ খঞ্জারিয়াহ। উপমহাদেশে যেটাকে বলা হয় খাড়া যবর। অক্ষরের 'ই' উচ্চারণ বোঝাতে ছোট আলিফটি অক্ষরের নিচে বাঁকা করে مُّدَّكِرٍহয়। (٠ِ), যাকে কাসরাহ বা যের বলা হয়। টেনে পড়া বোঝাতে অক্ষরের নিচে খাড়া আলিফ

দেয়া হয় অথবা শব্দের শেষে একটি ছোট ইয়া যুক্ত হয় যদি লম্বা টানটি শব্দের শেষে হয়। এভাবে অক্ষরের 'উ' উচ্চারণ বোঝাতে ছোট 'ওয়াও' ব্যবহৃত হয় (ٗ), যাকে বলা হয় দম্মাহ বা পেশ। এ ছাড়া شدةএর এ কে ছোট করে ব্যবহৃত হয় শাদ্দাহ বা তাশদীদের চিহ্ন (ّ)। খফিফ বোঝাতে ব্যবহৃত হতো 'خ' এর সংক্ষিপ্ত রূপ (এই চিহ্নটি বর্তমানে আর ব্যবহৃত হয় না)। এরপর বিভিন্ন যুগে এসব চিহ্ন কিঞ্চিৎ বিকশিত হয়েছে তিলাওয়াত যাতে সহজ হয় সেই উদ্দেশ্যে।

এভাবেই যুগে যুগে আল্লাহর বহু মনোনীত বান্দার মেহনত জড়িয়ে আছে আল্লাহর কিতাবের সাথে, আল্লাহর কালামের সহজতার স্বার্থে। আর এভাবেই আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেন।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

নিশ্চয় আমরা কুরআনকে সহজ করেছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব কে আছ উপদেশ গ্রহণ করবে?

(সূরা ক্বমার- ১৭)

৩. বিভক্তি, চিহ্ন, টীকা

আল্লাহর বাণী শাশ্বত। আরবদের ভাষায় নাযিল হওয়া কুরআন হেদায়েতের আলো হয়ে ভোরের মিষ্টি রৌদ্রের মতো প্রবেশ করেছে তামাম পৃথিবীর কোটি কোটি অন্ধকার ঘরে। তবে কুরআনুল কারীমের পাঠ অনারবদের জন্য কিছুটা কঠিনই ছিল, যদিও যার যার অন্তরের ইচ্ছার সমানুপাতিক আল্লাহই সহজ করে দেন আর এটা তো তাঁরই ওয়াদা। কুরআনের শাস্ত্রীয় শাখা-প্রশাখাগত জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন অগণিত অনারব। ইলমের প্রতি তৃষ্ণার্ত সেসব আত্মাদের জন্য এটা সহজ হলেও সাধারণদের কাছে কুরআনের পঠন বেশ দুরূহই মনে হতো। সেই নিমিত্তেই কুরআনকে আরও সহজ করে তুলে ধরতে কালক্রমে এতে বিকাশিত হয়েছে বিভিন্ন বিভক্তি, ছোট-খাটো নানান চিহ্ন ও প্রয়োজনীয় টীকা। উসমান (র)-এর সংকলিত মুসহাফে এমন অনেক চিহ্নই ছিল না, যা বর্তমানের মুসহাফগুলোতে রয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিদ্বানগণ

উপযুক্ততা ও মানুষদের জন্য সহজতার চিন্তা মাথায় রেখে নিজস্ব গবেষণার ওপর ভিত্তি করে কুরআনে এসব সংযোজন করেছেন। প্রাথমিকভাবে সাধারণ সময়ে কুরআন খতমের সুবিধার কথা ভেবে এবং রমাদানে ৩০ দিনের তারাবীতে পুরো কুরআন খতমের ক্ষেত্রে হিসাবের সুবিধার জন্য বিভিন্ন বিভক্তি পদ্ধতি বিকাশিত হয়। যেমন- জুয/পারা, হিসব, রুবু', ইত্যাদি। প্রথমদিকে কুরআনকে ৩০ ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, যাকে আমরা জুষ বা পারা বলে জানি। এরপর বিভক্তিগুলোকে আরও ক্ষুদ্রাকার রূপ দেয়া হয়, যাতে তিলাওয়াতকারীদের ভেঙে ভেঙে পড়তে আরও সুবিধা হয়। ফলে জুষকে দুইভাগে বিভক্ত করে হিযব এবং হিযবকে চার ভাগে বিভক্ত করে রুবু' এর প্রচলন ঘটে। এভাবেই কুরআনকে ৩০ টি জুয, ৬০ টি হিযব এবং ২৪০ টি রুবু'তে ভাগ করা হয়। প্রয়োজনীয়তার খাতিরে আরবী হরফগুলোতে নুক্তা সংযোজনের বিষয়ে আমরা পূর্বেও জেনেছি। এরপর ধীরে ধীরে আরও কিছু নতুন নতুন চিহ্নও সংযোজিত হতে থাকে। যেমন: অনেকে প্রতিটি আয়াতের শুরুতে আয়াতসংখ্যা সংযোজনের উদ্যোগ নেয়। এরপর আবার অনেকেই কুরআনের প্রতি পাঁচ আয়াত পর পর الخمس। শব্দটি এবং প্রতি ১০ আয়াত পর العشرশব্দটি জুড়ে দেন। পরবর্তী সময়ে আল-খমসকে সংক্ষিতভাবে দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং আল-'আশরকে দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয় সূরার শুরুতে সূরার নাম, নাযিলের স্থান, আয়াত সংখ্যা ইত্যাদি তথ্যের ক্যালিগ্রাফি ও বিভিন্ন জ্যামিতিক ডিজাইনের মাধ্যমে। ওয়াকফের বিধান বা নামের প্রথম অক্ষর, মাঝের অক্ষর বা শেষের অক্ষর ওয়াকফের চিহ্ন হিসেবে সংযোজিত হয়। এর পাশাপাশি মুসহাফের পাতার উভয়প্রান্তের মার্জিনের বাইরের অংশের খালি স্থানে বিভিন্ন টীকা, ব্যতিক্রম বিধান, অনুস্মারক ইত্যাদিও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। নুক্তা ও ই'জাম ব্যবহারের প্রচলন কে সর্বপ্রথম চালু করে সেই বিষয়ে জানা গেলেও, কুরআনের পঠনে এরূপ বিভক্তির প্রচলন কে সর্বপ্রথম শুরু করেছিল এই বিষয়ে তেমন কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। তবে বেশ কিছু আলিমদের মতে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাক্বাফী সর্বপ্রথম এই রীতি চালু করেন আর সেই ক্ষেত্রে বিভক্তির ভিত্তি ছিল অক্ষরের সংখ্যা। শাইখুল

ইসলাম ইবনু তইমিয়াহ ও এমনটিই উল্লেখ করেছেন, "জানা যায় যে, অক্ষরের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে প্রথমে আঠাশটি, পরবর্তী সময়ে ত্রিশটি এবং সাট অংশে কুরআন বিভক্ত ছিল। জুয বা হিযবের শুরু বোঝাতে বিভিন্ন চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হতো। হাজ্জাজ এবং তার পরবর্তী সময়ে এই রীতি শুরু হয়। বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ এর পক্ষে আদেশ জারি করে এবং ইরাক থেকেই মূলত এই রীতিটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তবে মদীনাবাসীরা এ সম্পর্কে অবহিত ছিল না...।"

রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতে, সাহাবাদের সময় এবং এর পরবর্তী সময়ে কুরআনের বিভাজনের আলাদা পদ্ধতি ছিল যেটা আমরা আওস ইবনে হুযাইফাহ এর হাদীস থেকেও জানতে পারি। তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের জিজ্ঞাস করি, তাঁরা কীভাবে কুরআনকে ভাগ করে নেয়। তাঁরা বললেন- তিন, পাঁচ, সাত, নয়, এগারো, তেরো এবং হিযবুল মুফাসসাল।"

অর্থাৎ, সাহাবাদের যুগে কুরআনকে তাঁরা নিম্নোক্ত ৭টি ভাগে ভাগ করতেন:

১ম ভাগ: প্রথম তিনটি সূরা-আল বাক্বারাহ, আলে ইমরান, আন নিসা (সূরা ফাতিহাও এর মাঝে রয়েছে)

২য় ভাগ: পরবর্তী পাঁচটি সূরা আল মাইদাহ, আল আনআম, আল আরাফ, আল আনফাল, আত তাওবাহ।

৩য় ভাগ : পরবর্তী সাতটি সূরা ইউনুস, হুদ, ইউসূফ, আর র'দ, ইবরাহীম, আল হিজর, আন নাহল।

৪র্থ ভাগ: পরবর্তী নয়টি সূরা-আল ইসরা, আল কাহাফ, মারইয়াম, ত্বহা, আম্বিয়া, আল হাজ্জ, আল মু'মিনুন, আন নুর, আল ফুরক্বান।

৫ম ভাগ: পরবর্তী এগারোটি সূরা-সূরা আশ শু'আরা থেকে সূরা ইয়াসিন।

৬ষ্ঠ ভাগ: পরবর্তী তেরোটি সূরা সূরা আস সফফাত, আল হুজুরাত।

৭ম ভাগ: হিযবুল মুফাসসাল-সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস (তিওয়ালে মুফাসসাল- সূরা ক্বফ থেকে সূরা বুরুজ; আওসাতে মুফাসসাল- সূরা ত্বারিক থেকে সুরা আদ-দুহা' কোনো কোনো মতে সূরা বাইয়িনাহ পর্যন্ত; কিসারে মুফাসসাল- সুরা ইনশিরাহ বা সুরা যিলযিলাহ থেকে সূরা নাস)

ইরফান ফী উলুমিল কুরআন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৪

মাজমু'উল ফাতওয়া, ১৩তম খন্ড

আবু দাউদ-১৩৯৩

টপকাপি পান্ডুলিপির চিত্র (লিপি: কুফিক)

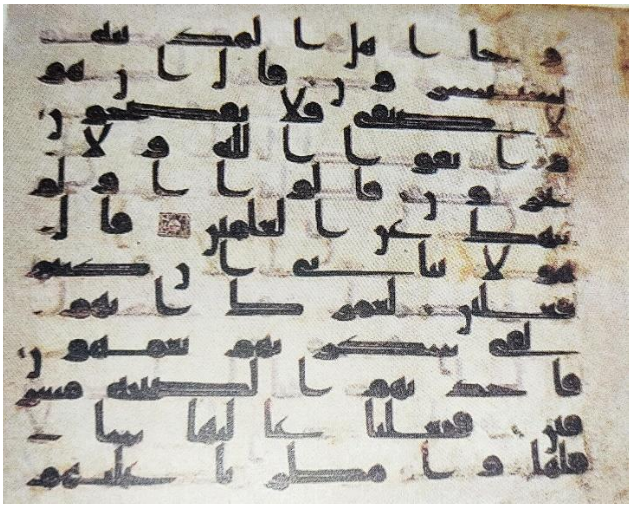

তাশখন্ডে সংরক্ষিত পান্ডুলিপির চিত্র (লিপি: কুফিক)

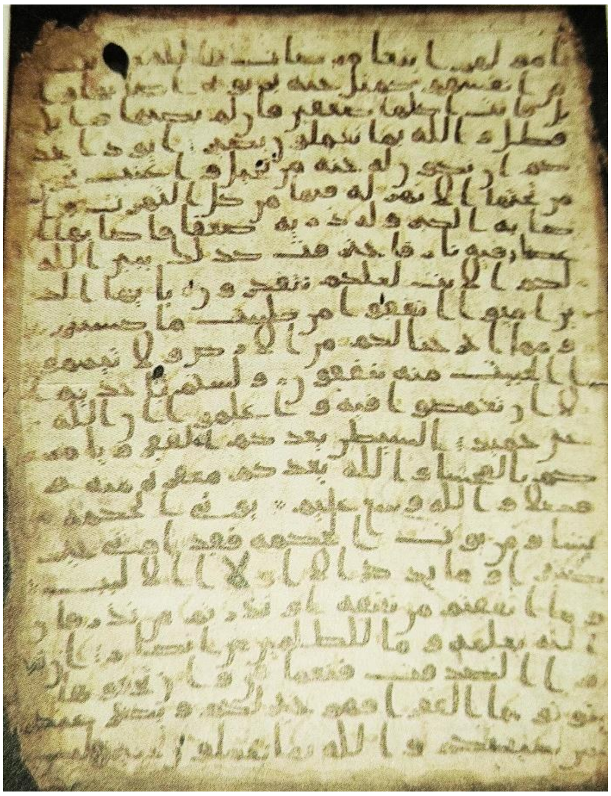

ফ্রান্সের জাতীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ছবি (লিপি: হিজাযী)

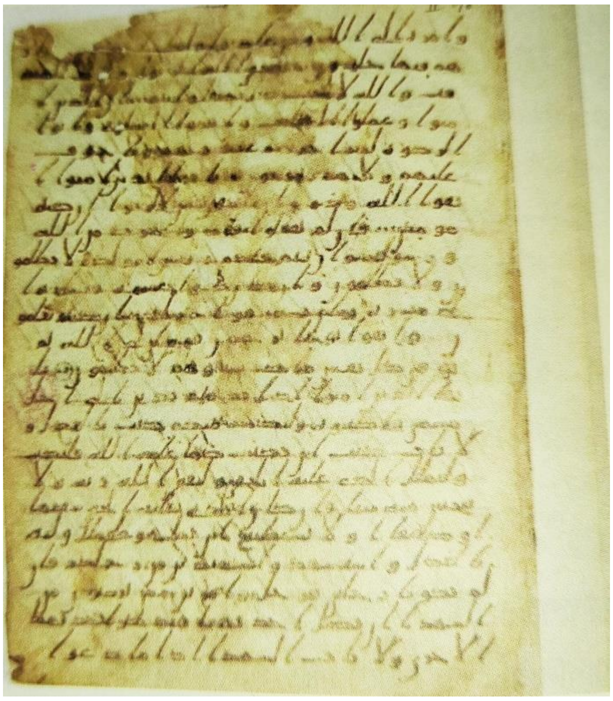

সানায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ছবি (লিপি: হিযাজী)

তাজউইদ যেভাবে এল

১. কবে?

তাজউইদ নতুন কিছু নয় বরং আরবী ভাষার সাথে এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই বলা যায় আরবী ভাষা যত পুরানো তাজউইদও ততোটাই প্রাচীন। আরবদের মাঝে কাব্য-সাহিত্য রচনার একটা ঝোঁক ছিল অনেক আগ থেকেই। সেই কারণেই তারা বেশ বাকপটু ছিল এবং শব্দচয়ন ও উচ্চারণের বিষয়ে তারা ছিল সচেতন। কুরআন নাযিল হওয়ার পর তাজউইদের নিয়ম কানুনগুলো আল্লাহর রাসূল ﷺ হাতে কলমে সাহাবাদেরকে শিখিয়েছেন আর এরপর থেকেই ধাপে ধাপে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী পর্যন্ত এসেছে।

হিজরির পরবর্তী চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত তাজউইদ ইলমের পৃথক কোনো শাখা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেনি। আবু মুযাহিম আল খাক্কানী (র) প্রথমবারের মতো তাজউইদকে ইলমের একটি পৃথক শাখা হিসেবে অভিহিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম তাজউইদের আহকামগুলো নিয়ে মোটামুটি সামষ্টিক কিতাব রচনা করেন, যা আল কাসিদাতুল খাক্কানিয়্যাহ নামে পরিচিত। যদিও তাজউইদের নিয়ম-কানুনগুলো আগ থেকেই বিদ্যমান ছিল যেহেতু কুরআন তাজউইদের নিয়ম-কানুনসহই নাযিল হয়েছিল। ইবনে মাস'উদ (র) থেকে এ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত হাদীস রয়েছে। একজন ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (র)-এর সামনে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় তিনি তিলাওয়াত করলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَا وَ الْمَسٰكِينَ

গ্বাইয়াতুন নিহায়া, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩২১

তা শুনে ইবনে মাস'উদ (র) বললেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ এভাবে পাঠ করতেন না!" লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, "তিনি আপনার কাছে এটি কীভাবে পাঠ করেছেন?" তিনি উত্তরে বলেন, " لِلْفُقَرَآءِ", ফুক্বারা-ই শব্দটিতে তিনি স্বর দীর্ঘায়িত করলেন।

এখান থেকে মাদ্দু মুত্তাসলের বিধান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যদিও সেই সময়ে তাজউইদের উক্ত নিয়মটি মাদ্দু মুত্তাসিল নামে পরিচিত ছিল না, শুধু ব্যবহারিকভাবে হুকুম প্রয়োগ হতো। উক্ত হাদীসটি একটি প্রমাণ যে তাজউইদ অধ্যয়ন নবী ﷺনিজেই শিখিয়েছিলেন এবং সাহবাগণ তাজউইদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোকেও এভাবেই অন্তরে গেঁথে নিয়েছিলেন।

তাজউইদের উসূল, হুকুম বা নিয়ম-কানুনগুলোর নামকরণ আরও পরে হয়েছিল যেমনটি হাদীস শাস্ত্র বা তাফসীরশাস্ত্রের উসূলের নামগুলোর ক্ষেত্রে হয়েছে। উসূল পূর্বেই উপস্থিত ছিল কিন্তু সেগুলোর নির্দিষ্ট কোনো নাম তখন লিপিবদ্ধ আকারে ছিল না। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জমানায় আরবরা তাদের নিজ ভাষায় খুব পারদর্শী ছিল, যার কারণে দেখে দেখে পাঠ করার সময়ও তাদের কোনো হারাকাহ বা নুক্তার প্রয়োজন হতো না। উমার (র) থেকে বর্ণিত আছে, কোনো একটা বিষয় নিয়ে সাহাবাগণ আলোচনা করছিলেন এবং এর সমাধান খুঁজতে গিয়ে তাঁরা কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। এক যুবক কোনো একটা কথার জবাব দিয়েছিলেন এবং ভুল ব্যাকরণ প্রয়োগ করে কথাটা বলেছিলেন। এতে উমার (র) বলেন, "যে সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তোমার ব্যাকরণগত ভুল আমাকে তা থেকেও বেশি উদ্বিগ্ন করেছে।" অর্থাৎ বুঝা গেল যে, সাহবাগণ ব্যাকরণ সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞান রাখতেন এবং এই বিষয়ে বেশ রক্ষণশীল ছিলেন। ইসলাম যখন অনারবদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে তখন তারা যাতে সঠিক ও সহজভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে তাই আরবীর লিখিত রূপে কিছু পরিবর্ধন আনা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কারণে সেই সময়ের উম্মাহর বিদ্বান রাহবারগণ আরবীর লিখিতরূপে বিভিন্ন লক্ষণ যুক্ত করতে শুরু করেন, যা নিয়ে আমরা পূর্বেও বিস্তারিত জেনেছি।

সুনানে সাঈদ ইবনু মানসুর- ১০২৩; আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, সুরুত্বী- ১/২৫৭; বুগইয়াতু ইবাদির রহমান ফী তাজউইদিল কুরআন পৃষ্ঠা - ২৩। আসারটির সনদ সহীহ।

২. কেন?

বিভিন্ন চিহ্ন সংযোজনের ফলে কুরআন দেখে পড়া সহজ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু একটা সমস্যা তখনো রয়ে গিয়েছিল। আরবী অক্ষরমালায় এমন অনেক অক্ষর রয়েছে যেগুলোর উচ্চারণ অন্যান্য ভাষাগুলোতে নেই। ফলে কুরআন পাঠের সময় অনারবদের ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা রয়েই গিয়েছিল। তাই অক্ষরগুলোর উচ্চারণগত উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আরব-অনারব সকলে কুরআন তিলাওয়াতের সময় যাতে সঠিক উচ্চারণ করতে পারে এবং অক্ষর উচ্চারণজনিত কাঠিন্য দূর করতে তা নথিভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এভাবে অক্ষরগুলোর উৎপত্তিস্থল নিয়ে গবেষণা শুরু হলো, যাকে বলা হয় মাখরাজ। মাখরাজ অর্থ বের হওয়ার স্থান। ইলমুত তাজউইদের ভাষায়-মুখের ভেতর যে সমস্ত স্থানে স্পর্শ হয়ে অক্ষরগুলোর উচ্চারণ বের হয়ে আসে সেগুলো একেকটি মাখরাজ। যেমন ২ ঠোঁট থেকে '' অক্ষরটির উচ্চারণ, দাঁতের পেছনে জিহ্বার ডগা স্পর্শ করে 'ত' এর উচ্চারণ ইত্যাদি। তবে, এখানে আরও একটি সমস্যা দেখা দিলো। যদি কোনো ভাষায় 'প' অক্ষরটি থাকে কিন্তু 'ব' না থাকে, এমতাবস্থায় যখন কেবল বলা হবে যে, '' এর উৎপত্তিস্থল দুই ঠোঁট তখন এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে তারা 'বা' এর পরিবর্তে 'পা' উচ্চারণ করে ফেলবে। অপরদিকে আরবী বর্ণমালায় এমন কিছু বর্ণ রয়েছে, যেগুলোর মাঝে মাখরাজের দিক থেকে সাদৃশ্যতা রয়েছে কিন্তু একটির উচ্চারণ হালকা অপরটির উচ্চারণ ভারী। সুতরাং দুই অক্ষরের মাঝে এই সাদৃশ্যজনিত বিভ্রান্তি দূর করতে মাখরাজ ছাড়া আরও কিছু বিষয় নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন তাজউইদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা 'সিফাত'-এর বিকাশ ঘটে। এভাবেই নানান সময় ইলমুত তাজউইদে প্রতিনিয়ত নিয়ম-কানুন নথিভুক্ত হয়ে এসেছে।

৩. কীভাবে?

যদিও হিজরীর ৪র্থ শতাব্দীর দিকে তাজউইদ ইলমের একটি পৃথক শাখা হিসেবে অভিহিত হয়, তবে ২য় শতাব্দী থেকেই তাজউইদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এককভাবে লিপিবদ্ধ হতে শুরু হয়েছিল। যেমন আবু আমর (র) যিনি দশ কিরাআতের কুররাদের মধ্যে একজন ছিলেন, দ্বিতীয় শতাব্দীতে তিনি ইদগাম কাবীর সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। নিবন্ধটির নাম ছিল 'كتاب اللأدغام الكبير' । এ ছাড়া আবু আমর আদ-দানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হিজরীর ২য় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলিম আবু বকর ইবনে মুজাহিদ ২ ধরনের লাহন উল্লেখ করতে গিয়ে তাজউইদ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে তাজউইদ শব্দটি পূর্বযুগেও ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে শব্দটি ততটা ব্যবহৃত হতো না। পূর্বে তাজউইদের পরিবর্তে বলা হতো তাহসীন, তারতীল, হুসনুল আদা ইত্যাদি। এ রকম আরও ছোট-খাটো নিবন্ধ বা পুস্তিকা পূর্বে লেখা হয়ে থাকলেও মূলত হিজরীর চতুর্থ শতাব্দীতে এসে আবু মুযাহিম আল খাক্বানী (র) তাজউইদকে ইলমের পৃথক একটি শাখা হিসেবে ধারণা প্রদান করেন।

তাজউইদ পরিচিতি

১. প্রয়োজন

ভাষা মানুষের অন্তরের ভাবনাগুলোর বহিঃপ্রকাশ। একে অপরের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম। তাই সামাজিক জীবনে ভাষা শিক্ষা, এর ব্যবহার ও সংরক্ষণের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা বাংলা ভাষাভাষী। আর বিশ্বব্যাপী অন্যতম সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হচ্ছে ইংরেজি। এই দুটি ভাষার মধ্যে একটি মিল হচ্ছে, এই দুই ভাষারই মৌখিক রীতি শিক্ষা, ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান রয়েছে। ইংরেজি ভাষার প্রায়োগিক এই জ্ঞানকে বলা হয় Phonology। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই জ্ঞানকে বলা হয় ধ্বনিতত্ত্ব। আনুমানিক ৬৫০০ ভাষার মধ্যে প্রায় সব ভাষারই মৌখিক

ব্যবহার সম্পর্কে এরূপ সুবিন্যস্ত আলোচনা রয়েছে। এই শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তিনটি, যা আগেই বলা হয়েছে:

১. ভাষা শিক্ষা

২. ভাষার ব্যবহার

৩. ভাষার সংরক্ষণ

কিন্তু মানুষ সচরাচর তার পরিবেশ থেকে শ্রবণের মাধ্যমে ভাষা রপ্ত করে থাকে। এমতাবস্থায় এর ব্যবহার সম্পর্কে ভাষা ব্যবহারকারীর কিতাবি কোনো জ্ঞান থাকে না বললেই চলে। ভাষা শিক্ষা ও এর ব্যবহারজনিত জ্ঞানের অনুপস্থিতির কারণে বিকৃত হতে হতে ভাষা একটা সময় অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। একে অবশ্য গবেষকগণ ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবর্ধমান ধারা বলেই আখ্যায়িত করেন। যেমন: old English বা ইংরেজির পুরাতন রীতিতে Stone, Home, Wrote শব্দগুলোকে বলা হতো Stan, Ham, Wrat। বাংলা ভাষাতেও আমরা এর নজির পাই-চন্দ্র হয়ে গিয়েছে চাঁদ, খাইয়াছি হয়েছে খেয়েছি, সুবর্ণ থেকে স্বর্ণ ইত্যাদি। যেহেতু ভাষা এমনিতে পরিবর্তনশীল তাই অধিকাংশ ভাষার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত শাস্ত্রের ওপর নজর দেয়া ততটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় না।

----

https://www.linguisticsociety.org/content/english-changing

আরবী প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ একটি ভাষা। প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার শব্দের সম্ভারেণ সাজানো এই ভাষাটি বাংলা, ইংরেজিসহ বাকি সকল ভাষা থেকে অনেকটাই ভিন্ন। কারণটা হচ্ছে, এই ভাষাতেই নাযিল হয়েছে মহান আরশের রব আল্লাহ -এর কালাম। তাই আপন রবের বিধানগুলো জানতে এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। হিদায়াতের নূর বক্ষে ধারণ করতে কোটি কোটি আরব-অনারব প্রতিনিয়ত আরবী পড়তে শিখছেন। অনেকেই ইলম অর্জন করছেন কুরআন-হাদীসে আরবী ভাষার

ব্যবহাররীতি জানার উদ্দেশ্যে। বাকি সকল ভাষার মতো এই ভাষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধারণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। কারণ, আরবী ভাষার অপরিবর্তনশীলতার ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে কুরআনের সংরক্ষণ। তাই এই ভাষার সঠিক শিক্ষা, সঠিক প্রয়োগ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজিতে phonology, বাংলায় ধ্বনিতত্ত্ব। আর আরবীতে আমরা বলি صَوتيات বা عِلْمُ الأَصْوَات(ইলমূল আশ্বওয়াত) যা عِلْمُ التَّجْوِيدِ (ইলমুত তাজউইদ) এর অন্যতম প্রাসঙ্গিক বিষয়। অন্যান্য ভাষার উক্ত শাস্ত্রের তুলনায় আরবী ভাষার তাজউইদের ব্যাপকতা ও ব্যবহার ব্যাপক বিস্তৃত।

২. তাজউইদের সংজ্ঞা

তাজউইদের আভিধানিক অর্থ হলো:

التَّحْسِينُ অর্থাৎ উন্নতকরণ

الإِتْقانُ অর্থাৎ পারদর্শিতা, দৃঢ়তা

আরবী ভাষার প্রতিটি অক্ষরকে উত্তমভাবে উচ্চারণ করা এবং এতে পারদর্শিতা অর্জন করাই হলো তাজউইদ।

তাজউইদ শাস্ত্রের উলামাদের ব্যাখ্যানুযায়ী তাজউইদ হচ্ছে- প্রতিটি অক্ষরকে তার সঠিক উচ্চারণস্থল থেকে বের করে উচ্চারণ করা এবং যথাযথভাবে প্রতিটি হরফের বৈশিষ্ট্য প্রদান করা।

আল-হুসাইনি আয যাবিদী এ-এর রচিত তাজুল উরূস মিন জাওয়াহিরিল কামুস নামক অভিধানে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার শব্দ যুক্ত করেন। উক্ত অভিধানটি ৪০ খণ্ডের।

আল-মুখতাস্বারুল মুফীদু ফী আহাম্মি আহকামিত তাজউইদ, পৃষ্ঠা: ৩

তাজউইদকে সংজ্ঞায়িত করাতেযভাবে মাহমুদ খলীল আল হুসারী এ বলেন, "কোনো কাজে এমনভাবে সম্পন্ন করা, যেভাবে তা সম্পন্ন করা উচিত এবং তাতে দক্ষাতামান্য করাই হচ্ছে তাজউইদ...।

কালাউইদ সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞানকে বলা হয় ইলমুত তাজউইদ। আর এই জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করতে যে সক্ষম হয় তাকে বলা হয় মুজাওয়্যাদ।

ভাষার মৌখিক রীতির নিয়ম-কানুন শিখে তা যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে শতাব্দী ধরে ভাষাকে অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছে, আরবী ব্যতীত এমন আর কোনো ভাষা এই পৃথিবীতে আছে বলে মনে হয় না। এটা সম্ভব হয়েছে বিশ্বব্যাপি মুসলিম সমাজে তাজউইদ শিক্ষার ব্যাপকতার কারণে।

৩. ইলমুত তাজউইদের হুকুম

তাজউইদ সম্পর্কিত জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

التَّجْوِيدُ الْعِلْمِي النَّظَرِي :

التجويد العلميহচ্ছে এমনভাবে তাজউইদের হুকুম-আহকামগুলোর তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করা যাতে অন্যকে শেখানো যায়। তাজউইদের ইলম বা এর তত্ত্বগত জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেকের ওপর ফরজে কিফায়া। যে পারদর্শী তার জন্য মানুষকে শিক্ষাদান করাও ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ, যদি কোনো অঞ্চলে তাজউইদ শেখানোর মতো একজন ব্যক্তিও না থাকে তাহলে সেই অঞ্চলের আওতাভুক্ত সকল মানুষ গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে।

التَّجْوِيدُ الْعَمِيل / التَّطبِيقِي :

التجويد العميلহচ্ছে তাজউইদের হুকুম-আহকামের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যাতে সঠিকভাবে নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করে শুদ্ধভাবে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা যায়। তাজউইদের হুকুম-আহকামগুলো তত্ত্বগতভাবে সমাজের সকলের না জানলেও চলবে। কিন্তু বিশুদ্ধভাবে তাজউইদের আনুহকামসমূহ প্রয়োগ করে কুলাসের তিলাওয়াত করা প্রত্যেকের ওপর ফরজে আইন।

৪. ইলমুত তাজউইদের উৎস

القرآن الكريم :

তাজউইদের কিছু নিয়ম-কানুন কুরআনেই উল্লেখ রয়েছে। কুরআনে বর্ণিত সেসব নিয়ম-কানুন পালন করা ওয়াজিব। যেমন: সূরা মুযযাম্মিল, ৪

السنة النبوية :

তাজউইদের অধিকাংশ নিয়ম-কানুন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কিছু কিছু নিয়ম সরাসরি রয়েছে আর কিছু রয়েছে যেগুলো তাজউইদের নিয়মের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। এর মাঝে কিছু বিধান পালন করা ওয়াজিব আর কিছু এমন রয়েছে যেগুলো সুন্নাহ বা মুস্তাহাব পর্যায়ের। যেমন: সূরা তাওবাহর ৬০ নং আয়াতের বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ-মাদ্দু মুত্তাসিল বিষয়ক হাদীস যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

الإجماع :

তাজউইদের কিছু নিয়ম-কানুনের স্বপক্ষে নবী ﷺ-এর পরবর্তী জামানা থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত উম্মাহর মাঝে বিভিন্ন সময় গবেষণার ভিত্তিতে ইজমা' হয়েছে। এটিও ইলমুত তাজউইদের একটি উৎস।

আহকামু কিরাআতিল কুরআনিল কারীম, পৃষ্ঠা: ১৭ আহকামু কিরাআতিল কুরআনিল কারীম, পৃষ্ঠা: ২৫

আল-মুখতাস্বারু ফী আহকামিত তাজউইদ, পৃষ্ঠা: ১১; আল-মুখতাস্বারুল মুফীদু ফী আহাম্মি আহকামিত তাজউইদ, পৃষ্ঠা: ৩; আহকামু কিরাআতিল কুরআনিল কারীম, পৃষ্ঠা: ১৭-১৮

আল মুখতাস্বারু ফী আহকামিত তাজউইদ, পৃষ্ঠা: ১১। (جماع) ইজমা' একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ কোনো বিষয়ে সকল জনগণ একমত হওয়া। ইমাম যুবাইদী হানাফী বলেন- " الاجماع أي اجماع الأمة:الإتفاق وযুগের ইকমাস অর্থাৎ উম্মাতের ইজমা' ঐকমত্য।" ইসলামিক পরিভাষায় শরীআতের কোনো হুকুমের ব্যাপারে একই মুজতাহিদদের ঐক্যমতকে ইজমা' বলে।

শেষ কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবানি ও রহমতে 'কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ ইতিহাসের' শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আল্লাহর রহমতে এমন একটি প্রেশিয়াস এবং মুফিদ বিষয়ে লিখার তাওফিক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন বুঝে পড়ার, অন্তরে ধারণ করার এবং জীবনে বাস্তবায়ন করার সর্বোচ্চ তাওফিক দান করুন। আমীন ইয়া রব্ব।

আল্লাহর এই অধম বান্দীকে দু'আয় স্মরণ রাখার অনুরোধ!

تَــــمَّـــــتْ بِالْخَــيْــــرِ

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110774257/